দৈনিক সংবাদ

তারিখ 25 OCT 1991 পৃষ্ঠা 4 কলাম ১

# কোষ্ঠী বিচার নয়, চাই সাহসী ভূমিকা

অনিরুদ্ধ

সংবাদপত্রে মাধ্যমিক পরীক্ষা ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার মেধা তালিকা প্রকাশ হয়। তাতে বিশেষ ধরনের কয়েকটি স্কুল-কলেজের কৃতিত্ব নিয়ে একজন পাঠক প্রশ্ন তুলেছিলেন। তার পত্রটা ছাপা হয়েছে। তা নিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। তার একটা জবাবও দিয়েছেন একজন অধ্যক্ষ।

স্বীকার করতে হবে, একটা আস্থাহীনতা সর্বত্র বাসা বেঁধেছে। রাজনীতিতে, শিক্ষাঙ্গনে, শিক্ষাদান ও পরীক্ষা গ্রহণে। সুতরাং এ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। জবাব, পাল্টা জবাবে সেই সংশয়ের মেঘ কাটে না। তারপর আরও একটা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে অনেক বিদ্বজ্জনের মনে। মেধা তালিকার সচিত্র প্রকাশ। বাপ-মায়ের সঙ্গে তাদের সহাস্য চিত্র। গর্বিত মাতা-পিতা। এই দৈন্যপীড়িত, হাহাকারগ্রস্ত দেশে আমার এই দৃশ্য ভাল লাগে, কিছু তরুণ-তরুণীর ভবিষ্যৎ স্বপ্ন। বাপ-মায়ের আনন্দ।

তাও আজ পরীক্ষার কাঠগড়ায়, সংশয় থেকে, কিছু নেপথ্য খবর গুজব কানাকানি থেকে। বছর দুয়েক আগে হবে এরকম একজন মেধাবী ছাত্রীকে একটি সাপ্তাহিকে টিটকারী দেয়া হয়েছিল। কে পাস করেছে তার ৫ জন গৃহশিক্ষক না ওই কিশোরী। তাদের আর্থিক সঙ্গতিও আক্রমণ থেকে রেহাই পায়নি। দরিদ্র-দরদী, সর্বহারা বিলাসীদের কলম থেকে। অথচ এরা কেউ নিজেদের দিকে তাকান না, সম্ভবত মেধা তালিকা নিয়ে চিঠিটাই এই অঘটনের মূল। টান পড়েছে কৃতকার্যদের সাফল্য নিয়ে। তাদের নিয়ে এত হৈচৈ-তেও একধরনের ঈর্ষাবোধ।

অতীতে আমাদের সময়ে কি ছিল, কি ছিল না। এখনকার বিশ্ব পরিস্থিতি সবই এসেছে ছাত্রছাত্রীদের মেধা, পরীক্ষার ফল উচ্ছ্বাস নিয়ে।

কেউ বলেন যে, একধরনের বৈষম্য। বৈষম্য তো বটেই আজকে শহরনগরীর ছেলেমেয়েরা প্রতি-যোগিতায় ছাড়িয়ে যায়। গ্রাম থেকে কেউ উঠে আসে না মেধা তালিকায়। এই পরিবর্তনের পেছনে যারা আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাটা বিশেষ এক ধাঁচের বলে প্রধানত মনে করেন, তারা কি বৃটিশ আমলে কিংবা পাকিস্তানী আমলে সেই আদিম সাম্যবাদী সমাজের কাছাকাছি ছিলেন। নতুবা শিক্ষাব্যবস্থা থেকে শুরু করে পরীক্ষার ফল, তার প্রচার নিয়ে এত হৈচৈ হবে কেন। আগে যা হতো না, এখন তা কেন হয়, তার কারণ তথ্য বিপ্লব। ধারণার পরিবর্তন। যা একসময় খবর হিসেবে গুরুত্ব পেত না। এখন পায়।

আগে ব্যাপক নকল হত না। এখন নকল হয়। নকলকারী শিক্ষকের ওপর হামলা করে। অনেক কেন্দ্রে পরীক্ষা, স্থগিত থাকে। কিন্তু শিক্ষকদের কথা কেউ ভুলেও বলেন না। তারা সমাজ নিয়ে মাথা ঘামান। গরবাচেভ, বরিস ইয়েলৎসিনের আচরণ, ব্যর্থ ক্যুর ছায়া কিভাবে আমাদের সবকাজে ছায়া ফেলছে, তারও নিপুণ বিবরণ তুলে ধরেন। মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা কি পড়তে চায়, কেন রাজনীতি পছন্দ করে না, তা নিয়ে ভ্রূকুটি করেন। মন্তব্য ছুড়ে দেন। নিজেদের ভূমিকার কথা বলেন না। কেন ১৮টি কলেজ থেকে কেউ পাস করেনি। কেন ২৮ দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকার পর খোলার প্রথম দিনেই একজন ছাত্রকে দুটো ক্লাসের একটা করতে হয়। উদ্বিগ্ন অভিভাবকের জবাবে ছাত্রটি যখন বলে, বোমাবাজির জন্য নয়, শিক্ষক মহোদয় অনুপস্থিত ছিলেন। বছরে ৬ মাস শিক্ষাঙ্গন বন্ধ থাকে এমনিতেই। আর বিশ্ববিদ্যালয় তো সন্ত্রাসের কারণে বারবার বন্ধ হচ্ছে। যে ক'দিন খোলে শিক্ষকদের পাওয়া যায় না, একটা চিঠি প্রকাশিত হয়েছে 'সংবাদ'-এ। কেউ এ নিয়ে লিখতে এগিয়ে আসেননি। অভিভাবকটি পুরো নাম দেননি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একসময় পলিটিক্যাল সায়েন্সের শিক্ষক ছিলেন নিউম্যান নামে। একজন অধ্যাপক, তিনি হাঙ্গেরীয়ান, যতদূর মনে পড়ছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কিংবা কয়েক বছর আগে পালিয়ে ইংল্যাণ্ড যান। হিটলারের ইহুদী পীড়নের মুখে। শোনা যেত তিনি যদি জানতেন পলিটিক্যাল সায়েন্সের কোন ছাত্র কমিউনিস্ট সদস্য, ফার্স্ট ক্লাস দিতে চাইতেন না। এর সত্যতা যাচাই করার সুযোগ হয়নি তখনকার দিনে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর অস্ট্রিয়ায় কিছুদিনের একটা সমাজতান্ত্রিক সরকার হয়েছিল। তখনকার রক্তাক্ত স্মৃতিও তাকে হানা দিত। কিন্তু এটা ছিল ব্যতিক্রম। আর এখন সর্বত্র কানাঘুষা, অমুক স্যার অমুক দলের সমর্থক। তার দলের সমর্থক ছাত্রদের তিনি ফার্স্ট ক্লাস দেন। এখানে ডান-বামের এক নীতি। তারপর অনেক শিক্ষক আছেন যারা স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পড়ান না। কোন ফাউণ্ডেশনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন কনসালট্যান্ট হিসেবে, আর শিক্ষা বহির্ভূত লেখালেখিতে ব্যস্ত থাকেন। অনেক অধ্যাপক ছাত্র কি সংস্কৃতি সংস্থার সেমিনারে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান। ক্লাস করার সময় কোথায়। কোর্স শেষ হয় না। পরীক্ষার খাতা বাক্সবন্দী রেখে কেউ বিদেশে ছোটেন। কার্যান্তরে ব্যস্ত থাকেন। যারা ততটা ভাগ্যবান নন তাদের কথা আলাদা। পত্রপত্রিকায় ছাত্রদের চিঠি ছাপা হয় —৬ মাস/৮ মাস হয়ে গেল অনার্সের ফল বেরুচ্ছে না। ছাত্রছাত্রীদের এই উদ্বেগ ও অভিযোগ সম্পর্কে একবার এক শিক্ষককে মাস ছয়েক আগে প্রশ্ন করেছিলাম, স্যার, ছাত্ররা তো এই অভিযোগ করে চিঠি দেয়। পত্রিকায় ছাপানো হয়। আপনারা কিছু বলেন না কেন। তারা তো আপনাদের বিরুদ্ধেই অভিযোগ করছে। এর সত্যমিথ্যা কিংবা ফল প্রকাশের অসুবিধাটা কোথায়, তার সম্পর্কে তো কেউ কিছু লিখছেন না। অভিযোগ খণ্ডনে কেউ এগিয়ে আসছেন না। তার জবাব শুনে আমি তাজ্জব। তিনি বললেন, হ্যাঁ এসব চিঠি চোখে পড়ে। আমরা হাসি। জবাব দেবার প্রয়োজন দেখি না। কেন হাসেন, উড়িয়ে দেন এধরনের গুরুতর অভিযোগ। পাল্টা প্রশ্ন করার উৎসাহ পাইনি। অপর একজন শিক্ষক একথা শুনে পরে আমাকে বললেন, খাতা তো পার্ট বাই পার্ট দেখা হয়। একজনে দেখেন না। সকলে সময় মত দেন না। একজনের কাছে আটকে থাকলে, অন্যরা সময়মত দিলেও ফল প্রকাশ সম্ভব হয় না। তাকে আর জিজ্ঞাসা করিনি। কোন ব্যবস্থা তারা নেন কি না। এটুকু জানা আছে প্রতিদিন বিলম্বের জন্য প্রাপ্য পারিশ্রমিক/সম্মানী থেকে কিছু কিছু টাকা কাটা হয়। এক ধরনের জরিমানা। কিন্তু এর জন্য ফলাফল প্রকাশের অনিয়ম দূর হয়নি।

মেধা তালিকার কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের ছবি ছাপানো হয়। তাদের কৃতিত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অভিজাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এদের অধিকাংশ বেরিয়ে আসছে। এরা সবাই খুব উচ্চবিত্ত নয়। বাপ-মা তাদের কষ্টার্জিত সঞ্চয় থেকে ছেলেমেয়েকে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠান। তারা মেধাবী, কিন্তু রাজনীতিবিমুখ হয় বলে আমরা আক্ষেপ করি। আগের দিনে মেধাবী ছাত্ররাই ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্ব দিত। এখন যারা দেয় তারা মেধায় মধ্যম বা পেশাদার ছাত্র রাজনীতিক বলে আমরা কখনো উপহাস করি। আর সংকটের মুখে তাদের পিঠ চাপড়াই। গণ-আন্দোলনে তাদের ভূমিকা নিয়ে গর্ব করি। আমরা ভুলে যাই মেধাবী ছাত্রদের বিপথগামী করেছে উচ্চাভিলাষী রাজনীতিক নেতারা। অভি-নীরুর ইতিহাস তো আমাদের জানা। এদের পরিবারের পটভূমি তো তাদের এ পরিণতির দিকে ঠেলে দেয়নি। মেধাবী ছাত্রদের ফুসলিয়ে মস্তান করেছে যারা তাদের আমরা ক্ষণে ক্ষণে বন্দনা করি। আর এদের বর্তমান পরিণতির জন্য সব দোষ এদের ঘাড়ে চাপাই। এরা যাবে কোথায়। তাই দল পাল্টায়। ক্ষমতার ছত্রছায়া খোঁজে। এ দেখে যদি মেধাবী ছাত্রদের কেউ কেউ রাজনীতিতে বিরাগ প্রকাশ করে আমরা তাদের বুর্জোয়া মনোভাবের নিন্দা করি। আর রাজনৈতিক নেতাদের কোন ছেলে-মেয়েকে কেন বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে দেখা যায় না সে প্রশ্ন করি না। বিত্তবানরা তাদের ছেলেমেয়েদের কিন্ডার গার্টেনে পাঠায়, ক্যাডেট কলেজে দেয় কিংবা বিদেশে পাঠায় বলে উষ্মা প্রকাশ করি। ৫ জন শিক্ষক রেখে পড়ানোর খবরে আমাদের ভ্রূকুঞ্চন লক্ষ্য করার মতো। ক্লাসে শিক্ষকরা যখন বলেন যে, তার কাছে কোচিং না পড়লে কোন প্রেস পাবে না কিংবা ফার্স্ট ডিভিশন মিলবে না। তা নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য শোনা যায় না। অভিভাবকরা এ ধরনের শিক্ষক সম্পর্কে সঙ্গত কারণেই মুখ খুলতে নারাজ। অনেক 'ভালো শিক্ষক' ক্লাসে পড়ান না। কোচিং করে মাসে নীচে ২৫ হাজার থেকে উর্ধ্বে ৬০ হাজার টাকা আয় করেন। ক্লাসে আসেন ক্লান্তি বিনোদনের জন্য। তাই ছাত্ররা তাদের বাবা-মায়ের আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষক রাখে। মফস্বলে সেরকম সুযোগ নেই। তাই গ্রামের স্কুল বা কলেজ থেকে কেউ এখন আর মেধা তালিকায় নেই। বি,এ, বি-কম পরীক্ষার ফল বেরুলে দেখা গেল ১৮টি কলেজ থেকে কোন ছাত্র পাস করেনি। কারণটা তো ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। শ্রেণীর দোহাই দেয়া হয়। বৃটিশ বা পাকিস্তান আমলে তো শিক্ষাঙ্গনে এধরনের পরিস্থিতি ছিল না। শ্রেণীচেতনা কিছু কম ছিল, এমন তো বলা যাবে না।

জাতীয় চরিত্রে ধস নামার ফলেই শিক্ষাঙ্গনের চিত্র আজ এরকম। মেধা তালিকা প্রকাশ করার ফলে কোন সমস্যার সৃষ্টি হয়নি। বোর্ডের দুর্নীতির কথা শোনা যায়। প্রশ্নপত্র ফাঁস কেলেংকারি তো একটি বোর্ডের ক্ষেত্রে প্রায় নিয়মিত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার সঙ্গে পরীক্ষায় কৃতিত্বকে জড়িয়ে দেখা কতখানি ঠিক। অবশ্য এভাবে কেউ দেখছেন না। সবটার দোষ চাপানো হয়েছে বর্তমান সমাজব্যবস্থার ঘাড়ে। তবে বিদেশে যারা যান উচ্চ শিক্ষাগ্রহণে কিংবা কোন ধনী পরিবারের ছেলেমেয়ে বিদেশেই শিক্ষা লাভ করেন প্রথম থেকে — তারা তো বেশীর ভাগ পুঁজিবাদী দেশেই যান। সুতরাং দোষটা শুধু সমাজের একথা কেমন করে মানি। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে যারা জড়িত, তারা কীভাবে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবেন। অনেকে প্রতিবেশী দেশের উদাহরণ দেন। সমাজব্যবস্থা অভিন্ন। শাসকদের চরিত্রে রকমফের আছে। গোত্রান্তরের যে কথা বলা হয়, তার কোন লক্ষণ নেই। পশ্চিমবঙ্গের উদাহরণ দেন। সেটা কী ভারতীয় অন্যান্য অঙ্গরাজ্য থেকে খুব পৃথক চরিত্রের। একটা বাম রাজনৈতিক ফ্রন্ট সেখানে ক্ষমতায় আছে। এটুকু পার্থক্য কেউ অস্বীকার করে না। বরং মৌলিক পার্থক্য যতটা আশা করা গিয়েছিল, তা হয়নি। রাজনৈতিক বিচার-বিশ্লেষণ তো তাই বলে। ভারতে বিজেপি'র উত্থানে তাদের অবদান আছে। সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গী তো উনবিংশ শতকের পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর ও রামমোহনের সঙ্গে তুলনা করতে ভরসা পাই না।

প্রাথমিক শিক্ষা বিপ্লব সম্পর্কে মতামত দিয়ে লণ্ডন থেকে একটা লেখা এসেছে। আজকেই তা এখানে ছেপে দিলাম। কিছুটা তথ্য বিভ্রান্তি আছে। প্রসঙ্গক্রমে দক্ষিণ ইয়েমেনের কথা এনেছেন তিনি। উত্তর ও দক্ষিণ ইয়েমেন অনেকদিন হল একীভূত হয়েছে। এভাবে যে সব দেশের উদাহরণ টেনেছেন তা তথ্যনির্ভর নয়, অনুমানভিত্তিক। অবশ্য সেখানে বক্তব্য প্রাথমিক শিক্ষা বিপ্লব সম্পর্কে।

আমাদের গোড়া থেকে গলদ এসেছে সেই পাকিস্তানী আমলের মনোভাব থেকে। দেশ স্বাধীন হল। পাকিস্তানী আমলেও বৃটিশ শাসন মুক্তির পর স্বাধীনতার স্বাদ কী রকম তা বুঝতে দেরী হয়েছিল। সেদিন সাম্প্রদায়িকতাকে মূলধন করেছিল শাসকশ্রেণী। তার সুযোগ কিছুটা আমরা নিয়েছিলাম। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সেই মনোভাবের প্রকাশ ঘটল ভিন্নরূপে। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি। সুতরাং নাবিস্কোর ম্যানেজারের পরিত্যক্ত বাসা দখল করলেন কেউ। এভাবে ধানমণ্ডীর বেশ কয়েকটি বাসায় জাঁকিয়ে বসলেন অনেকে। তাদের সরাতে বেগ পেতে হয়েছিল। অবাঙ্গালীরা চলে গেল। তাদের শূন্যস্থান পূরণের অশোভন প্রতিযোগিতায় বুদ্ধিজীবীদের একাংশ-কেও দেখা গিয়েছিল।

উনবিংশ শতকের চিন্তানায়কদের মধ্যে এই দৈন্য ছিল না। অথচ তাদের শ্রেণীর ঠিকুজী কোষ্ঠী নিয়ে আমরা গলদঘর্ম হই। আমাদের চরিত্র দিয়ে তাদের নাগাল ধরতে গিয়ে যা খুশি মন্তব্য করা হয়। তারা অনেকে কেন রাজনীতিতে আসেননি এ ক্ষোভ ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশ পায়। মোগল সম্রাট রাজা রামমোহন রায়কে বৃটিশ পার্লামেন্টে পাঠিয়েছিলেন তার দূত হিসেবে। তখন দিল্লীর সম্রাট তাকে রাজা উপাধি দেন। এজন্য রামমোহনের সামন্তবাদী চরিত্র নিয়ে কটাক্ষ করা হয়। বিদ্যাসাগরের ত্রুটি তো অহরহ খুঁজে বার করি। শিশুদের জন্য তার কোন রচনায় ধর্মসংক্রান্ত কোন লেখা নেই। নীতিমূলক মৌলিক লেখা লিখেছেন তাদের জন্য। বিদেশী গ্রন্থ থেকেও নিয়েছেন। শিশু মনকে গ্রহণের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত রাখার মনোভাব নিয়েই তিনি এই নীতি অবলম্বন করেছিলেন।

গণঅভ্যুত্থানের পর অস্থায়ী সরকারের আমলে একটা অনভিপ্রেত বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। পাঠ্যপুস্তকে 'সৃষ্টিকর্তা' শব্দটি ব্যবহার নিয়ে। বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় সৃষ্টিকর্তাকে নিজস্ব ধর্মীয় ভাষায় ব্যবহার করে। এখানে তার পরিবর্তে 'সৃষ্টিকর্তা' ব্যবহার কেন করা হয়েছে তার কৈফিয়ত হিসেবে বলা হয়েছিল, 'আমরা করিনি, আগের সরকার করেছে।' এ দ্বারা কি এটাই বুঝানো হয়নি, এই পরিবর্তনটা ভাল হয়নি। যেকোন সরকার কোন সঠিক পন্থা কোন একটা ক্ষেত্রে গ্রহণ করলে তা সমর্থন করার সাহস নেই। পাছে হুজুগে উচ্ছ্বসিত জনপ্রিয়তায় ঘাটতি পড়ে কিংবা কেউ ভুল বুঝে। আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের আমরা বিরোধিতা করেছি। কিন্তু তার মুসলিম পারিবারিক আইন যে এক ধাপ অগ্রগতি নারী অধিকারের ক্ষেত্রে তা স্বীকার করার অর্থ সামরিক শাসনের প্রতি-সমর্থন বুঝায় না।

শিশুমনে বৈষম্য সৃষ্টি না করার জন্য 'সৃষ্টিকর্তা'র কোন নির্দিষ্ট অভিধা ব্যবহার না করার নির্দেশ দিয়েছে ইউনেস্কো। যেমন নারী-পুরুষ বৈষম্য প্রকাশ না পায় তাই বহুল প্রচারিত 'চেয়ারম্যান' শব্দটির পরিবর্তে 'চেয়ারপার্সন' শব্দটি এখন ব্যবহার করা হয়। সেদিন আমরা এই সাধারণ যুক্তিটা দিতে ভয় পেয়েছি, আর উনবিংশ শতকে যারা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে তাদের শ্রেণীচরিত্র নিয়ে আমাদের উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার সীমা নেই। পাছে তাদের প্রতি মোহবশত আমাদের বিপ্লবী চরিত্রের ধার ভোঁতা হয়ে যায়।

আমরা শাসকদের, অর্থাৎ ক্ষমতাসীনদেরই শুধু দোষারোপ করি। বর্তমানে যারা ক্ষমতায় গিয়েছেন, তাদের আমরাই নির্বাচিত করে পাঠিয়েছি। তাদের দুর্বলতা-সবলতা আমরা জানি। শুধু জানি না তাদের দুর্বলতা ও সবলতায় আমাদেরও অবদান আছে। মরহুম জনাব তমিজুদ্দিন খানকে (তিনি এক সময় পাকিস্তান গণপরিষদের স্পীকার ছিলেন) একবার জনসভায় একজন শ্রোতা প্রশ্ন করেছিলেন যে, আপনারা নেতারা আগের মতন তেজস্বী সাহসী নেতৃত্ব দিতে পারছেন না কেন? জবাবে তিনি বলেছিলেন পাইন্যা (পানি মেশানো) দুধের সর পাতলা হয়। জনগণের চরিত্রের বলিষ্ঠতাই নেতৃত্বের স্রষ্টা। এখানে এই বলিষ্ঠতার চেতনা সঞ্চারে বুদ্ধিজীবীদের একটা ভূমিকা থাকে। শ্রেণীর দোহাই দিয়ে পাশ কাটানো কিংবা অতীতের স্মৃতিচারণ তার স্থান দখল করতে পারে না। চাই সাহসী ভূমিকা।

তারিখ 25 OCT 1991 পৃষ্ঠা 4 কলাম ২